তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ মহান আল্লাহর আদেশ যেমন- সালাত, সাওম, হজ, যাকাত পালন করা এবং নিষেধ যেমন- সুদ, ঘুষ, বেপর্দা, বেহায়াপনা ইত্যাদি পরিহার করে চলাকে ইবাদত বলে। তেমনিভাবে নবি ও রাসুলের দেখানো পথ অনুযায়ী একে অপরের সাথে উত্তম আচার ব্যবহার করাও ইবাদত। মূলত ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- হাক্কুল্লাহ (স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য) ও হাক্কুল ইবাদ (সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য) এর ধারণা লাভ করবো এবং এগুলো আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- হাক্কুল্লাহ (স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য) ও হাক্কুল ইবাদ (সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য) চিহ্নিত করে বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারব;
- সালাতের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- সাওমের (রোযার) গুরুত্ব ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- যাকাতের ভূমিকা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- হজের ধারণা ও নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিকতা অর্জনে হজের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- অসহায় ও দরিদ্রের অধিকার বর্ণনা করতে পারব;
- মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইলম (জ্ঞান) এর ধারণা, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষকের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং শিক্ষা ও নৈতিকতার ধারণা বর্ণনা করতে পারব;
- জিহাদের ধারণা, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব এবং সন্ত্রাসবাদের কুফল বর্ণনা করতে পারব;
- জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য অনুধাবন করে সন্ত্রাসমুক্ত মানবতাবাদী জীবনযাপনে সচেষ্ট হতে পারব;
- মৌলিক ইবাদতগুলো পালনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনে অগ্রসর হতে পারব।

পাঠ ১

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো চূড়ান্তভাবে দীনতা-হীনতা ও বিনয় প্রকাশ করা এবং নমনীয় হওয়া। আর ইসলামি পরিভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে সহজভাবে জীবনযাপন করার জন্য অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন।

আমরা আল্লাহর বান্দা। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

অর্থ : "জিন ও মানবজাতিকে আমি (আল্লাহ) আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

আমরা পৃথিবীতে যত ইবাদতই করি না কেন, সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এ ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য না হলে আল্লাহ্ তা কবুল করবেন না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।" (সূরা আল-বাইয়্যিনা, আয়াত ০৫)

কীভাবে ইবাদত করলে ও জীবনযাপন করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন, তা শেখানোর জন্য নবি-রাসুলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের অনুসরণ করতে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "(হে নবি!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসুলের আনুগত্য কর, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তো কাফিরদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৩২)

উক্ত আয়াত থেকে আমরা বুঝলাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল কর্তৃক নির্দেশিত পথ ও মত অনুসরণ করার নাম ইবাদত। সুতরাং তাঁদের নির্দেশিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারলে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হব।

ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য হলো বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানের। যদি মানুষ সে বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে না পারে তাহলে সে চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তার চেয়েও অধম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ আছে তা দ্বারা শুনে না; এরা পশুর ন্যায়। বরং অধিক নিকৃষ্ট (পশু হতে); তারা হলো অচেতন।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৭৯)। অতএব ইবাদত বলতে শুধু উপাসনাকেই বুঝায় না। বরং আল্লাহর খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে সকল কার্য আল্লাহর বিধানমতো করাই হলো ইবাদত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থ : "সালাত আদায় করার পর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ব্যাপৃত হবে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ১০)

এ আয়াতের মর্ম থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর আদিষ্ট কাজগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায় করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও কৃষিকাজ করা এবং বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও দুনিয়ার অন্যান্য সকল ভালো কাজ করা ইবাদত। এমনিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রহমতের আশা, শাস্তির ভয়, ইখলাস, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সব কাজই ইবাদতের মধ্যে শামিল।

আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর প্রদর্শিত পন্থা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে পরকালে আল্লাহ্ আমাদের পুরস্কৃত করবেন। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা শান্তি পাব।

হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ

ইবাদত প্রধানত দুই প্রকার : (ক) হাক্কুল্লাহ ও (খ) হাক্কুল ইবাদ ।

(ক) হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক)

আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ (حَقُّ اللّٰه) বলে । আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য অনেক ধরনের ইবাদত (কাজ) করি । সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট, এগুলো হলো হাক্কুল্লাহ, যেমন- সালাত (নামায) কায়েম করা, সাওম (রোযা) পালন ও হজ করা ইত্যাদি । এসব কাজ করার পূর্বে প্রত্যেক মানুষকে অন্তর থেকে যা বিশ্বাস করতে হবে তা হলো- আল্লাহ আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক (অংশীদার) নেই, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা । তাঁর আদেশেই পৃথিবীর সবকিছু আবার ধ্বংস হবে । আমাদের জীবন-মৃত্যু সবই তাঁর হাতে । পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত । তাঁর হাতেই সকল সৃষ্টির রিযিক । আমরা তাঁরই ইবাদতকারী । তিনি ব্যতীত উপাসনার উপযুক্ত আর কেউ নেই । এ সবকিছু মনে প্রাণে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করাই হলো বান্দার উপর আল্লাহর হক ।

আল্লাহর হক আদায় করতে হলে আমাদের অবশ্যই নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে :

১. সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করা ।
২. আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ।
৩. সর্বাবস্থায় নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ এবং তাঁর অনুগ্রহ কামনা করা ।

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আল্লাহর বিধানগুলো মেনে চলব; তাতে তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন । ফলে আমরা পরকালে তাঁর থেকে পুরস্কার পাব ।

(খ) হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক)

মানুষ সামাজিক জীব । সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষকে বসবাস করতে হয় । আমরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করি । একজনের দুঃখে অন্যজন সাড়া দেই । আপদে-বিপদে একে-অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করি । পরস্পরের প্রতি এই সহানুভূতি ও দায়িত্বই হাক্কুল ইবাদ (حَقُّ الْعِبَادِ) (বান্দার হক বা অধিকার) । কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, ইসলামে বান্দার হক তথা মানবাধিকারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

মানবাধিকার সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির হক রয়েছে। অন্যত্র রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন, "এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যেমন- সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ, দাওয়াত কবুল করা, মজলুমকে সাহায্য করা ও হাঁচির জবাব দেওয়া ।" (বুখারি ও মুসলিম)

মানুষের প্রতি মানুষের হক বা অধিকারকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন : (১) নিকটাত্মীয়ের হক, (২) দূরাত্মীয়ের হক, (৩) প্রতিবেশীর হক, (৪) দেশবাসীর হক, (৫) শাসক-শাসিতের হক, (৬) সাধারণ মুসলমানের হক, (৭) অভাবী লোকের হক এবং (৮) অমুসলিমের হক ।

আমরা আল্লাহর হক পালন করার সাথে সাথে মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হব ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কিত প্রতিটির উপর তিনটি করে উদাহরণ তৈরি করবে ।

পাঠ ২

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

পরিচয়

সালাত আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো নামায। এর অর্থ দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা ও রহমত (দয়া) কামনা করা। যেহেতু সালাতের মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নিকট দোয়া করে, দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তাই একে সালাত বলা হয়। ইসলাম যে পাঁচটি রুকনের (স্তম্ভের) উপর প্রতিষ্ঠিত তার দ্বিতীয়টি হলো সালাত। এ সম্পর্কে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

অর্থ : "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল; (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা; (৩) যাকাত দেওয়া; (৪) রমযানের রোযা রাখা; (৫) হজ করা।" (সহিহ বুখারি)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেবেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ –

অর্থ : "কিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে।" (তিরমিযি)

মহান আল্লাহ মুমিনের উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফরজ (আবশ্যক) করেছেন। তা হলো-ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। সালাত একজন মুমিনকে (বিশ্বাসী) মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

অর্থ : "নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ব্যতীত কখনোই সালাত ত্যাগ করা যাবে না।

ধর্মীয় গুরুত্ব

একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। ইমান মজবুত হয়, আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। মানুষকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে অভ্যস্ত করে তোলে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মনোযোগসহ সালাত আদায় করে, কিয়ামতের দিন ঐ সালাত তার জন্য নুর হবে।" (তাবারানি)

একদা হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথিদের লক্ষ্য করে বললেন- 'যদি কারও বাড়ির পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয় এবং কোনো লোক দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?' সাহাবিগণ উত্তরে বললেন, 'না' হে আল্লাহর রাসুল! তখন মহানবি (স.) বললেন- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিক তেমনি তার (সালাত আদায়কারীর)

গুনাহসমূহ দূর করে দেয়। মহানবি (স.) আরও বলেছেন, "সালাত হলো ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী।" (তিরমিযি)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "জামাআতে সালাত আদায় করলে একাকী আদায় করার চাইতে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।" (বুখারি ও মুসলিম)

আর আল্লাহ্ তায়ালাও সালাতকে জামাআতের সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

অর্থ : "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৩)

সামাজিক গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। সালাতের কারণে দৈনিক পাঁচবার মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। একে-অপরের খোঁজ-খবর নিতে পারে। সুখে-দুঃখে একে অপরের সহযোগিতা করতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। এমনকি নামাযের সারিতে দাঁড়াতে গিয়ে উঁচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ফলে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি হয়। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক সকল মতপার্থক্য ভুলে একসাথে কাজ করার শিক্ষা পায়।

সালাত আমাদেরকে সময়ের গুরুত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেয়। নেতার অনুসরণ করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে নিয়মিত সালাত আদায় করব। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা গ্রুপভিত্তিক সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্বের উপর পাঁচটি করে বাক্য তৈরি করবে।

পাঠ ৩

সাওম (اَلصَّوْمُ)

পরিচয়

সাওম আরবি শব্দ। এর ফার্সি প্রতিশব্দ হলো রোযা। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো– সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা।

প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষের উপর রমযান মাসের এক মাস সাওম পালন করা ফরজ। এটি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাওমের শিক্ষা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

সাওমের নৈতিক শিক্ষা

সাওম কেবল আমাদের উপরই ফরজ নয়। বরং পূর্বের সকল নবি-রাসুলের উম্মতের উপরও ফরজ ছিল। এর মাধ্যমে সাওম পালনকারীর আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাওমের মাধ্যমে মানুষের মনে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মানুষ মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে কিছুই পানাহার করে না ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে না।

মহান আল্লাহ বলেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থ : "তোমাদের উপর সাওম (রোযা) ফরজ করা হয়েছে। যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৩)

আমরা তাকওয়া অর্জনের জন্য রমযান মাসে সিয়াম পালন করব।

মানুষ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-ক্ষোভ ও কামভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। সাওম মানুষকে এসব কাজ থেকে মুক্ত থাকতে শেখায়। সাওম হলো কোনো ব্যক্তি ও তার মন্দ কাজের মাঝে ঢাল স্বরূপ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন-

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ

অর্থ : "সাওম (রোযা) ঢালস্বরূপ।" (বুখারি ও মুসলিম)

সর্বোপরি সাওম পালনের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হয়।

সাওমের সামাজিক শিক্ষা

সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। সাওম পালন করে এরূপ ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকার ফলে সে অন্য আরেকজন অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা সহজে বুঝতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা সে উপলব্ধি করতে পারে। এতে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "এ মাস সহানুভূতির মাস।" (ইবনে খুযায়মা)

রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ (স.) অন্যদের দান-সদকা করতে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছেন, তিনি নিজেও তেমনিভাবে খুব দান-সদকা করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "রাসুলুল্লাহ (স.) লোকদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন। বিশেষ করে রমযান এলে তার দানশীলতা আরও বেড়ে যেত।" (বুখারি ও মুসলিম)। সাওম অসহায় ও দরিদ্রকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করে।

সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব

ধর্মীয় দিক থেকেও সাওমের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। সকল সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু সাওম এর প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

অর্থ : "সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।" (বুখারি)

যেহেতু সাওয়াবের আশায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করা হয় সেহেতু আল্লাহ তায়ালা রোযাদারের পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। যেমন, মহানবি (স.) বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ-

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন।" (বুখারি)

এটি একটি মৌলিক ফরজ কাজ। যদি কেউ তা অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

সাওমের সামাজিক গুরুত্ব

সাওম পালনের মাধ্যমে একজন লোক ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে। সমাজের নিরন্ন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। সাওম (রোযা) পালনকারী ব্যক্তি অন্যায়-অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার করে চলে। হানাহানি থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় একে অপরকে সেহেরি ও ইফতার করায় এবং অভাবীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক বন্ধন আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয়। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং সাওমের সামাজিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আমাদের সাওম পালন করা উচিত। আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাওম পালন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সাওমের সামাজিক শিক্ষার উপর একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৪

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

পরিচয়

অর্থনৈতিকভাবে ধনী ও গরিব উভয় শ্রেণির মানুষ সমাজে রয়েছে। ধনী ও গরিবের মাঝে আর্থিক সমন্বয়সাধন করতে মহান আল্লাহ যাকাতের বিধান দিয়েছেন। যাকাত আদায় করলে সমাজের দুর্বল লোকেরাও আর্থিকভাবে সবল হয়ে উঠবে। ফলে ধনী ও গরিবের মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি হবে। এতে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকবে। হযরত মুহাম্মদ (স.) যাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন-

اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ

অর্থ : যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধ।" (বায়হাকি)

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও বৃদ্ধি পাওয়া। আর ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে তার সম্পদের শতকরা ২.৫০ হারে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে। নিসাব হলো ন্যূনতম সম্পদ, যা থাকলে যাকাত ফরজ হয়। এ ক্ষেত্রে যাকাত প্রদানে ধনীর সম্পদ পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। তাই একে যাকাত বলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত গরিবের প্রতি ধনীর দয়া নয় বরং এটা গরিবের অধিকার। তাই আল্লাহ যাকাত আদায় করাকে আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন−

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ : "তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর।" (সূরা আন-নূর, আয়াত ৫৬)

যাকাতের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের কথাও বলেছেন। যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়। যাকাতের সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। এসব কারণেই মহান আল্লাহ মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন।

সামাজিক গুরুত্ব

যাকাত সমাজ থেকে অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে পারস্পরিক সৌহার্দ স্থাপন করে। সামাজিক নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মাঝে সম্পদের বৈষম্য দূর করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط

অর্থ : "যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

সুতরাং সমাজে যাকাত ব্যবস্থা চালু করে বৈষম্য দূর করে সাম্যের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নৈতিক গুরুত্ব

যাকাত মানুষের মনে খোদাভীতি সৃষ্টি করে। পবিত্র ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। অপচয় রোধ করতে শেখায়। সর্বোপরি যাকাত মানুষের আত্মিক প্রশান্তি, নৈতিক উন্নতি, সম্পদের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

অর্থ : "আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র এবং পরিশোধিত করবেন।" (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ১০৩)

অতএব নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা যাকাত আদায় করব।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার উৎসগুলোর মধ্যে যাকাত হলো অন্যতম। এর উপর ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের সাফল্য নির্ভরশীল। এতে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। ধনীর সম্পদ পুঞ্জীভূত না থেকে দরিদ্র লোকদের হাতেও যায়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সচল হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত ও শক্তিশালী হয়। আর্থিকভাবে অসচ্ছল লোকগুলো ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। দিনে দিনে সম্পদশালী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ

অর্থ : "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৬)

আমরাও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের চেষ্টা করব।

ধর্মীয় গুরুত্ব

কোনো মুসলমান যাকাত না দিলে সে আর পরিপূর্ণ মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেন-

اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

অর্থ : "যারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালও অস্বীকারকারী।" (সূরা হা-মীম আস্-সাজদা, আয়াত ৭)

যাকাত অস্বীকার করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করার শামিল। ইসলামি আইনে যাকাত দানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সালাত ও সাওম শারীরিক ইবাদত। আর যাকাত হলো আর্থিক ইবাদত। সুতরাং যাকাত আদায় করা একজন মুসলিমের ইমানি দায়িত্ব।

যাকাত অসহায় ও দরিদ্রের অধিকার

যাকাত প্রদান করা দরিদ্রের প্রতি ধনী লোকের কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং যাকাত হলো দরিদ্র লোকের প্রাপ্য বা অধিকার। কেউ ইসলামের অনুসারী হলে তার উচিত স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করা এবং অসহায় লোকদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন-

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

অর্থ : "আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।" (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৯)

তাই সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদ ভোগ করার পূর্বে চিন্তা করবে যে, এতে অসহায়দের অধিকার আছে। তাদের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। অন্যথায় সমুদয় সম্পদ তার জন্য অপবিত্র হয়ে যাবে। পরিণামে তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "আর যারা স্বর্ণ ও রুপা (সম্পদ) জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দিন।" (সূরা আত্-তাওবা, আয়াত ৩৪)

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে বেকার ও গরিবদের জন্য অনেক কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। এতে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। দারিদ্র্য দূরীভূত হবে এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। ধনী-দরিদ্রের মাঝে সম্পদের বৈষম্য দূর হবে। কাজেই ধনীদের শরিয়তের বিধান অনুসারে যাকাত আদায় করা একান্ত আবশ্যক।

কাজঃ শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্বের উপর একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৫
হজ (اَلْحَجُّ)

পরিচয়

হজ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি। 'হজ' এর আভিধানিক অর্থ হলো- সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) ও

সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ বলে। হজ ঐ সমস্ত ধনী-মুসলমানের উপর ফরজ যাদের পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

অর্থ : "মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)।

সামর্থ্যবানদের জন্য হজ জীবনে একবার পালন করা ফরজ।

হজের নিয়মাবলি

হজের মোট ৩টি ফরজ রয়েছে। যথা-

১. ইহরাম বাঁধা (আনুষ্ঠানিকভাবে হজের নিয়ত করা)।

২. ৯ই জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত (১০ই জিলহজ ভোর থেকে ১২ই জিলহজ পর্যন্ত যেকোনো দিন কাবা শরিফ তাওয়াফ করা)।

হজের ওয়াজিব-৭টি। যথা-

১. ৯ই জিলহজ দিবাগত রাতে মুযদালিফা নামক স্থানে অবস্থান করা।

২. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ (দৌড়ানো) করা।

৩. ১০, ১১, ও ১২ই জিলহজ পর্যায়ক্রমে মিনায় তিনটি নির্ধারিত স্থানে ৭টি করে কংকর (পাথর কণা) শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা।

৪. কুরবানি করা।

৫. মাথা কামানো বা চুল কেটে ছোট করা।

৬. বিদায়ী তাওয়াফ করা (এটি মক্কার বাইরের লোকদের জন্য ওয়াজিব)।

৭. দম দেওয়া। (ভুলে বা স্বেচ্ছায় হজের কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে তার কাফফারা হিসাবে একটি অতিরিক্ত কুরবানি দেওয়া)।

অপর পৃষ্ঠায় চিত্রের মাধ্যমে হজের কার্যক্রমগুলো দেখানো হলো।
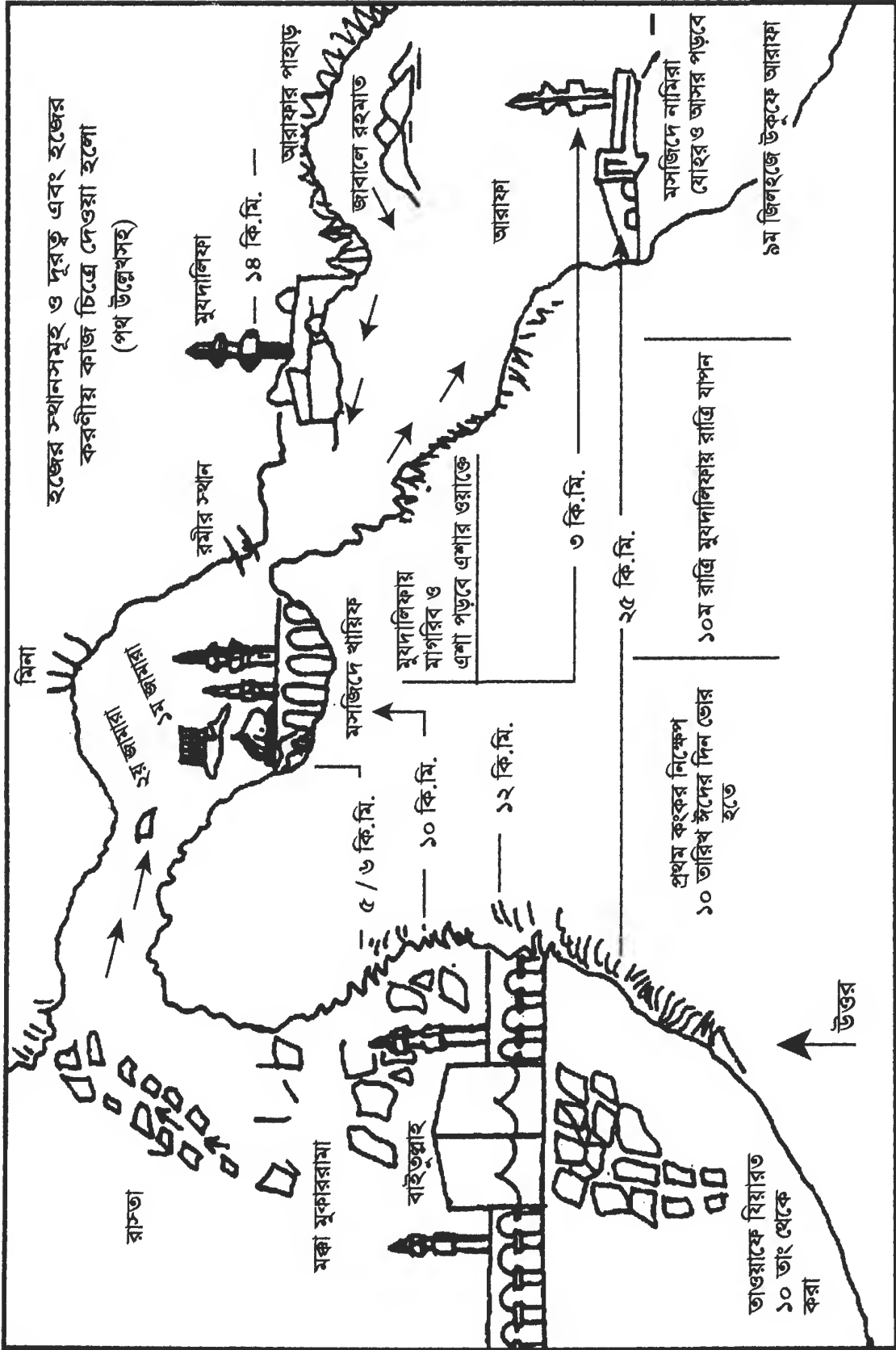
ছবি : হজ্জের স্থানসমূহ

হজের ধর্মীয় গুরুত্ব

ইসলামে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা হাজ্জ নামে একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ হজের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ্ (স.) থেকেও হজের গুরুত্বের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ্ (স.) বলেন-

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ-

অর্থ : "মাকবুল (আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়) হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই।" (বুখারি-মুসলিম)। হজের মাধ্যমে বিগত জীবনের গুনাহ্ মাফ হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ করে সে যেন নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।" (ইবনে মাজাহ)

হজ অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যাবে। আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হজ করার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

সামাজিক গুরুত্ব

হজের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়। প্রতিবছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম একই স্থানে সমবেত হয়। হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, "এবং মানুষের নিকট হজের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার নিকট (মক্কায়) আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে আরোহণ করে। তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ২৭)

হজে এসে সবাই একই রকম পোশাক পরিধান করে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সমর্পণ করে। সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ করে বলতে থাকে লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক : হাজির হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে হাজির।

হজের শিক্ষা ও তাৎপর্য

ধন-সম্পদ, বর্ণ-গোত্র ও জাতীয়তার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকলেও হজ এসব ভেদাভেদ ভুলিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়। হজ মুসলমানদের আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। রাজা-প্রজা, মালিক-ভৃত্য সকলকে সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করায়। একই উদ্দেশ্যে মহান প্রভুর দরবারে উপস্থিত করে সাম্যের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ মানুষকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দিয়ে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ শেখায়। পারস্পরিক ভাব ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সৌহার্দবোধ জাগ্রত করে। আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার কারণে সাধারণ মানুষ হাজিদের সম্মান করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর রহমত পেতে হলে তাঁর আদেশ পালনার্থে ধনী মুসলমানদের যতশীঘ্র সম্ভব হজ আদায় করা উচিত। আমরাও হজ থেকে শিক্ষা লাভ করে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হব।

কাজ : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে প্রতি দলের একজনকে 'হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন' এর উপর ২/৩ মিনিট বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পাঠ ৬

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এ অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ সামাজিক জীব। পৃথিবীর কোনো মানুষই একা তার সকল কাজ করতে পারে না। শিল্পায়নের এ যুগে জীবনধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই একে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এক ব্যক্তির অধীনে একাধিক ব্যক্তি কাজকর্ম করে। এতে কেউ মালিক হয় আবার কেউ হয় শ্রমিক। মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মালিক শ্রেণি যেমন শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না তেমনিভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন মালিক শ্রেণির বেতন-ভাতার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের কাজ করে শ্রমের মূল্য গ্রহণ করা ঘৃণার কাজ নয়। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)ও শ্রমিকের কাজ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো– কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম ও পবিত্র? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির নিজ শ্রমের উপার্জন এবং সৎব্যবসালব্ধ মুনাফা। (বায়হাকি)

ইসলাম অধীনস্থ লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

অর্থ : "তোমরা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে ভালো আচরণ কর এবং নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, মুসাফির ও তোমাদের অধীনস্থ যেসব দাস-দাসী (শ্রমিক) রয়েছে তাদের প্রতিও সদয় হও।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩৬)

মালিক ও শ্রমিকের মাঝে এক চমৎকার দৃষ্টান্ত আমরা হযরত আনাস (রা)-এর জীবন থেকে পাই। তিনি বলেন, "আমি দশ বছর যাবৎ রাসুলুল্লাহ (স.)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমার সম্পর্কে কখনো উহ! শব্দ বলেননি এবং কখনো বলেননি, এটা করোনি কেন ? এটা করেছ কেন ? আমার বহুকাজ তিনি নিজ হাতে করে দিতেন।" (বুখারি)

হযরত উমর (রা) আমিরুল মুমিনিন ছিলেন। জেরুজালেম সফরে উটের পিঠে চড়া ও উট টেনে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি সাম্য ও মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উটের পিঠে চড়া ও উটের রশি টানার বিষয়ে নিজের ও ভৃত্যের মাঝে পালাক্রম ঠিক করে নিয়েছিলেন। মালিক-শ্রমিকের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। বিদায় হজ্জের সময় রাসুল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, একজন অধীনস্থ কর্মচারীকে কতবার ক্ষমা করা যেতে পারে? হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছিলেন–

كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ

অর্থ : "দৈনিক সত্তর বার।" (তিরমিযি)

মনিবের উচিত তার শ্রমিকের শক্তি ও সামর্থ্য বিচার করে তাকে কাজ দেওয়া। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন–

وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيْقُ

অর্থ : "তাকে (শ্রমিককে) তার সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ দেওয়া যাবে না।" (মুসলিম)

খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ করে সকল কাজে মালিক শ্রমিকের মাঝে কোনো বৈষম্য ইসলাম অনুমোদন করে না। শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "তারা (যারা তোমাদের কাজ করে) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সে (মালিক) যা খায় তার অধীনস্থদেরও যেন তা খাওয়ায়। সে (মালিক) যা পরে তাদেরকে যেন তা পরতে দেয়। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না যা তার ক্ষমতার বাইরে। এমন কাজ (ক্ষমতার বাইরের) হলে তাকে (শ্রমিককে) যেন সাহায্য করে।" (বুখারি ও মুসলিম)

খুব দ্রুত শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন–

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

অর্থ : "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ)

পারিশ্রমিক দিতে অকারণে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। শ্রমিক যাতে তার শ্রমের সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মজুরের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করো না।" একইভাবে শ্রমিককেও তার মালিকের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "গোলাম (শ্রমিক) যখন তার মালিকের কাজ সুচারুরূপে করে এবং সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর ইবাদত করে তখন সে দ্বিগুণ প্রতিদান পায়।" (বুখারি ও মুসলিম)

মালিক-শ্রমিক যদি ইসলাম স্বীকৃত পন্থায় তাদের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে আর মালিকও তার সঠিক শ্রম পাবে। শ্রমিক ও মালিকের মাঝে কোনো দিন মনোমালিন্য হবে না। কল-কারখানায় স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করবে। কাজেই দেশ ও জাতির কল্যাণে আমাদের ইসলাম প্রদত্ত আদর্শ শ্রমনীতি অনুসরণ করা উচিত।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ক্লাসে শ্রমিকের অধিকারের উপর ১০টি বাক্য তৈরি করবে।

পাঠ ৭

ইলম (জ্ঞান)

ইলম আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো- জ্ঞান, জানা, অবগত হওয়া, বিদ্যা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। অপরদিকে ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা। তাই প্রতিটি মুসলিম কার আনুগত্য করবে এবং কীভাবে করবে? কার নিকট আত্মসমর্পণ করবে? এবং কীভাবে আত্মসমর্পণ করবে? তা অবশ্যই জানতে হবে। ইলম ব্যতীত তা জানা যাবে না। তাই ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) এর গুরুত্ব এত বেশি যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিলের সূচনা করেছেন পড়ুন (اِقْرَأْ) শব্দ দ্বারা। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ-

অর্থ : "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক, আয়াত ১)। সুতরাং পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয়

বিধায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে এবং পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি ও অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞানীর মর্যাদা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।" (সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত ১১)

ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের উপর ফরজ (আবশ্যক) করেছে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : "ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

হযরত মুহাম্মদ (স.) অন্যত্র জ্ঞানার্জনকে উত্তম ইবাদত বলে অভিহিত করেছেন। ইলমের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে যে ধরনের ইলম অর্জন করলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা যায়, বৈধ-অবৈধ বোঝা যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায় তাই হলো উত্তম ইলম।

ইলম-এর প্রকারভেদ

ইলম দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ (ক) দীনি ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) ও (খ) দুনিয়াবি ইলম (পার্থিব জ্ঞান)।

দীনি ইলম বলতে সাধারণত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন- কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, তাফসির ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

আর দুনিয়াবি ইলম বলতে শুধু পার্থিব উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানকেই বুঝায়। যেমন- গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদির জ্ঞান।

অন্যভাবে ইলমকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ (ক) গ্রহণীয় জ্ঞান (খ) বর্জনীয় জ্ঞান।

গ্রহণীয় জ্ঞান হলো যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে। যেমন– নৈতিক জ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল, পদার্থ-রসায়নসহ সকল কল্যাণকর জ্ঞান। আর বর্জনীয় জ্ঞান হলো যে জ্ঞান মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়। যেমন– অনৈতিক জ্ঞান, চুরি, ডাকাতি, অন্যায়, জুলুম, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় বা দেশ থেকে একদলকে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের জ্ঞানে পণ্ডিত হতে হবে, অন্যথায় সকলকেই আল্লাহর নিকট পরকালে কৈফিয়ত দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ

অর্থ : "তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১২২)

সুতরাং আমাদের মধ্যে একদল লোককে অবশ্যই দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে দীনি শিক্ষার ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনিভাবে পার্থিব শিক্ষা অর্জনেরও গুরুত্ব রয়েছে। তবে তা অবশ্যই আল্লাহর কোনো বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না। বরং তার সাথে নৈতিকতার সমন্বয় থাকতে হবে। কারণ শিক্ষার সাথে

নৈতিকতা থাকলেই কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। আর শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যায়।

মূলত ইসলামের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা। যেমন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন– "দীন (ধর্ম) হলো কল্যাণ করা।" (মুসলিম)। তাই যেসব ইলম মানবজীবনে কল্যাণ সাধন করে তা অর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য। সুতরাং যে ইলম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধন করবে তা আমরা শিখব ও শিখাব।

কাজ : শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে গ্রহণীয় জ্ঞান ও বর্জনীয় জ্ঞানের উপর ৫টি করে উদাহরণ পেশ করবে।

পাঠ ৮

শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

যে নিয়মিত লেখাপড়া করে এবং শেখার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল থাকে তাকে শিক্ষার্থী বলা হয়। একজন প্রকৃত শিক্ষার্থীর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। নিম্নে একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো–

১. শিক্ষকগণের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

২. সাক্ষাৎ হলে বিনয়ের সাথে সালাম দিয়ে তাঁদের খোঁজ-খবর নেওয়া।

৩. শিক্ষক যা শিক্ষা দেন তা মনোযোগ সহকারে শোনা ও পালন করা।

৪. সব সময় শিক্ষকগণের সাথে নম্র, ভদ্র ও উত্তম আচরণ করা।

৫. সহপাঠীদের সাথে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

৬. নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা।

৭. শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।

৮. শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখা।

৯. শ্রেণিকক্ষে বা অন্য কোথাও শিক্ষকের সাথে দেখা হলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সম্মান করা।

১০. অনুমতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাওয়া।

১১. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উত্তম শিক্ষা মেনে চলা।

১২. শিক্ষকগণ অপছন্দ করেন এমন কাজ না করা।

১৩. কোনো অবস্থাতেই কারও সাথে অভদ্র আচরণ না করা।

১৪. সর্বাবস্থায় শিক্ষকের কল্যাণ কামনা করা ও মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দোয়া করা।

১৫. সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

১৬. শেখার প্রতি উৎসাহী হওয়া ও সর্বদা শিক্ষকের সাহচর্যে থাকার চেষ্টা করা।

১৭. সবকিছু বুঝেশুনে পড়া, না বুঝে পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করা।

১৮. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যা পাঠদান করবেন তা লিখে নেওয়া।

১৯. জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা পরিহার করা।

২০. প্রতিদিনের পড়া নিয়মিতভাবে আয়ত্ত করা।

২১. পরের দিনের পড়া পূর্বের দিন দেখে ক্লাসে যাওয়া।

ইমাম শাফেয়ি (র.) ছাত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর শিক্ষক আল্লামা ওয়াকি (র.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– "ছাত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো সকল পাপকাজ বর্জন করা।"

আমরা শিক্ষার্থীর এ বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করব ও আদর্শ ছাত্র হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের উপর ৫টি প্ল্যাকার্ড বাড়ির কাজ হিসেবে তৈরি করে আনবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৯

শিক্ষকের গুণাবলি

যিনি আমাদের শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষক। পৃথিবীতে সবচাইতে সম্মান ও মর্যাদার পেশা হলো শিক্ষকতা। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেছেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

অর্থ : "আমাকে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পেশার লোকের বৈশিষ্ট্যগুলোও শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে শিক্ষকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ক. একজন ভালো শিক্ষক অবশ্যই আদর্শবান হবেন। তিনি- (১) আদর্শিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন; (২) নিজস্ব ধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য জীবন দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন; (৩) উত্তম আদর্শের ভিত্তিতে তিনি ছাত্রদের গড়ে তুলবেন; (৪) কথা ও কাজে মিল রাখবেন; (৫) আদর্শ প্রচারে কৌশলী ও সাহসী হবেন; (৬) শিক্ষকতাকে নিজের জীবনের পেশা ও ব্রত হিসেবে নেবেন; (৭) দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে এ পেশায় আত্মনিয়োগ করবেন ও (৮) অন্যায়ের ব্যাপারে আপসহীন হবেন।

খ. একজন ভালো শিক্ষক অবশ্যই গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তিনি– (১) সবসময় জ্ঞানচর্চা করবেন; (২) ক্লাসে পড়ানোর জন্য আগেই প্রস্তুতি নেবেন; (৩) সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা রাখবেন; (৪) মেধা বিকাশে সহায়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন; (৫) বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করবেন।

গ. একজন ভালো শিক্ষক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হবেন। তিনি– (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন; (২) শালীন, মার্জিত ও ব্যক্তিত্বরক্ষাকারী পোশাক পরিধান করবেন; (৩) বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গির অধিকারী হবেন; (৪) মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখবেন; (৫) নিয়মনীতির ক্ষেত্রে কঠোর হবেন; (৬) সুস্থ মন ও দেহের অধিকারী হবেন।

ঘ. একজন ভালো শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সম্পন্ন হবেন। তিনি–

(১) স্নেহ-মমতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন।

(২) সকল শিক্ষার্থীকে সমান চোখে দেখবেন।

(৩) ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান লাভের উৎসাহ তৈরি করবেন।

(৪) প্রয়োজনে একটি বিষয় বার বার বলবেন।

(৫) ছাত্রদের একান্ত আপনজন হবেন।

(৬) শিক্ষার্থীদের অহেতুক ধমক দেবেন না অথবা শাসন করবেন না।

(৭) তাদেরকে প্রহার বা তাদের প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন করবেন না বরং দরদি মন নিয়ে তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন। প্রখ্যাত সাহাবি মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলানি রাসুল (স.) সম্পর্কে বলেন, "আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে সুন্দর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক আর দেখিনি। আল্লাহর কসম তিনি আমাকে বকাবকি করেননি, মারেননি এবং গালমন্দও করেননি।" (মুসলিম)

ঙ. একজন ভালো শিক্ষক বিচক্ষণ হবেন। তিনি ছাত্রদের মনমেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

চ. একজন ভালো শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রতি হবেন আন্তরিক ও দরদি। প্রশাসনের সাথে থাকবে তাঁর সুসম্পর্ক।

কর্মজীবনে আমরা শিক্ষকতার মহান পেশায় নিযুক্ত হলে এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করব এবং আদর্শ শিক্ষক হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে একজন ভালো শিক্ষকের গুণাবলির উপর ১০টি বাক্য লিখবে।

পাঠ ১০

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

শিক্ষক হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর। পিতা-মাতার পরই শিক্ষকের মর্যাদা। শিক্ষক পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা-মাতা সন্তানকে জন্ম দিয়ে শুধু লালন-পালন করেন। পক্ষান্তরে শিশুদেরকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন একজন শিক্ষক।

শিক্ষার্থীরা অনুকরণপ্রিয়। কাজেই একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, শিক্ষার্থীরা তাই শিখবে। শিক্ষার্থীদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী হবে শিক্ষকরাই ছোট বেলায় তা শিখিয়ে দেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যা তারা পরিণত বয়সে কাজে লাগিয়ে সার্বিক উন্নতি লাভ করে। ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় শিক্ষকগণ যেভাবে ত্যাগের পরিচয় দেন তার জন্য শিক্ষকগণের যথাযথ সম্মান করা আমাদের কর্তব্য।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন, শিক্ষকও তেমনি তাঁর ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎ পথ দেখান। পুত্র তার পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, অন্যদিকে ছাত্রও তার শিক্ষক থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র যেমন পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পরিচর্যা করে বড় সম্পদশালী হতে পারে, শিক্ষার্থীও তেমনি শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ করে বড় জ্ঞানী হতে পারে।

নবি ও রাসুল (আ.)গণ হলেন শিক্ষক আর তাঁদের উম্মত হলো তাঁদের ছাত্র। রাসুলুল্লাহ (স.) এই উম্মতের জ্ঞানীদেরকে নবিদের উত্তরাধিকারী বলেছেন। তিনি বলেন, "আলেমগণ (জ্ঞানীরা) হলেন নবিদের উত্তরাধিকারী। তাঁরা

সম্পদ ও মালের উত্তরাধিকারী নন, বরং তাঁরা হলেন জ্ঞানের উত্তরাধিকারী।" (তিরমিযি)

সুতরাং পুত্র ও পিতার মাঝে যেমন উত্তরাধিকারের সম্পর্ক আছে। ছাত্র-শিক্ষকের মাঝেও তেমন সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই আমরা এই সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) বলেছেন, "যার কাছে আমি একটি শব্দও শিখেছি আমি তার দাস। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রি করতে পারেন কিংবা আযাদ করে দিতে পারেন কিংবা ইচ্ছা করলে দাস বানিয়েও রাখতে পারেন।" তাই তাঁর মতে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হলো ভৃত্য-মুনিব সম্পর্ক। এক বিনম্র শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। বস্তুত ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হবে সুন্দর, যেখানে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালোবাসা বিরাজ করবে।

কাজ : শিক্ষকের সাথে ছাত্রের আচরণ কেমন হওয়া উচিত- শিক্ষার্থীরা এর উপর একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১১

শিক্ষা ও নৈতিকতা

শিক্ষা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাহীন জাতি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো। সঞ্চিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে নিজের জীবনে সফলভাবে প্রয়োগ করাকেই শিক্ষা বলে। এই শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে এবং মানব হৃদয়কে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশসাধন। এখানে শিক্ষা বলতে বিশেষভাবে ইসলামি শিক্ষাকেই বোঝানো হয়েছে। আর যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরা হয়েছে তাকে ইসলামি শিক্ষা বলে। এককথায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে সমন্বিত শিক্ষাই হলো ইসলামি শিক্ষা। এ শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সৎ, চরিত্রবান, খোদাভীরু, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে।

ইসলাম শিক্ষার মূল উৎস হলো দু'টি–

১. আল-কুরআন : এই কুরআনে মানবজাতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুই মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : "কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি।" (সূরা : আল-আনআম, আয়াত ৩৮)

অন্যত্র আল্লাহ আরও বলেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : "আমি সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে আপনার উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা আন্-নাহল, আয়াত ৮৯)

২. আল হাদিস : রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বাণী, কাজ ও মৌন সম্মতি হলো হাদিস। এটি ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় উৎস। হাদিসের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ : "রাসুল (স.) তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

কুরআন ও হাদিস ব্যতীত ইসলাম ধর্মবিশারদদের ঐকমত্য (ইজমা) এবং তাঁদের সাদৃশ্যমূলক অভিমত (কিয়াস) ইসলামি শিক্ষার যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ উৎস।

একজন মুসলমানের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নেওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো ইসলামি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মূলত ইসলামি শিক্ষার ভিত্তি : তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি ও রাসুলগণ (আ.)-এর কার্যক্রম ও দাওয়াত) ও আখিরাত (মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি) এ তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এগুলোর আলোকে জীবন গড়ব এবং জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করব।

নৈতিকতা

সততা, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টি কথা ও উন্নত চরিত্র- এ সবকিছুর সমন্বয় হলো নৈতিকতা। একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাল-চলন, উঠা-বসা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন সবকিছুই যখন প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয় তখন তাকে নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে। এই নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ (স.) সর্বোত্তম লোক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।" (বুখারি ও মুসলিম)

নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় গুণ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা অর্জন করলে তার জীবন সুন্দর ও উন্নত হয়। এর মাধ্যমে সে অর্জন করে সম্মান ও মর্যাদা। ইসলামি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। নীতিহীন ও চরিত্রহীন মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, "তাদের হৃদয় আছে উপলব্ধি করে না, চোখ আছে দেখে না; কান আছে শুনে না; এরা হলো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট। আর এরাই হলো গাফিল।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৭৯)

আমরা নৈতিকগুণে সমৃদ্ধ হব এবং তা চর্চা করে উত্তম মানুষ হব।

নৈতিকতার গুরুত্ব

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষকে ইমান ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহানবি (স.) প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমি মহান নৈতিক গুণাবলিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।" (বুখারি)

নৈতিকতার কথা শুধু মুখে বললে চলবে না। বরং বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শসমূহ জীবনে বাস্তবায়ন করে নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নীতিবান লোককে পরিপূর্ণ মুমিন হিসেবে অভিহিত করে বলেন-

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا-

অর্থ : "চরিত্রের বিচারে যে লোকটি উত্তম মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণ ইমানের অধিকারী।" (তিরমিযি)

মানুষের নৈতিকতা যত উন্নত হবে, সে তত উত্তম মানুষে পরিণত হবে। এভাবে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (স.)-এর

প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই লোকটিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যার আখলাক (নৈতিকতা) সবচাইতে সুন্দর।" (বুখারি)। এমনিভাবে জনৈক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট জানতে চাইলেন মহান আল্লাহ মানুষকে অনেক কিছু দান করেছেন; এর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান দান কোনটি? নবি করিম (স.) বললেন, "সবচেয়ে মূল্যবান দান সুন্দর চরিত্র।"

আমাদের উচিত সুন্দর চরিত্র ও নৈতিক আচরণ অর্জন করে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর প্রিয়পাত্র হওয়া। ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা সম্পর্কে জানা ও তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা অধিকতর সহজ। ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ নৈতিকতা লাভ করতে পারে। তাই বলা যায় যে, নৈতিক শিক্ষা ইসলামি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও নৈতিকতা বিষয়ে ১০টি বাক্য বাড়ির কাজ হিসেবে তৈরি করে আনবে এবং শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১২

জিহাদ (اَلْجِهَادُ)

পরিচিতি

জিহাদ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় জান-মাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দীনকে (ইসলামকে) সমুন্নত করাই হলো জিহাদ। অনেকেই জিহাদ বলতে (শুধু) রক্তপাত ও কতল (হত্যা) বোঝেন। এটা সঠিক নয়। কেননা জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। পৃথিবীর যা কিছু উত্তম তাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধু জিহাদ হতে পারে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৭৮)

বস্তুত সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের চেষ্টা, শ্রম ও সাধনাই হলো জিহাদ।

জিহাদের প্রকারভেদ

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকার-

(১) স্বীয় নফসের (প্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করা। যেমন হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ

অর্থ : "প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

এরূপ জিহাদকে রাসুলুল্লাহ (স.) সবচাইতে বড় জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলেছেন–

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

অর্থ : "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের (কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ) দিকে ফিরে এসেছি।" (কানযুল উম্মাল)

(২) জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ করা। এরূপ জিহাদকে পবিত্র কুরআনে জিহাদে কাবির (বড়) বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○

অর্থ : "সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের (জ্ঞানের) সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল জিহাদ চালিয়ে যান।" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৫২)

(৩) ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এটি হলো জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

জিহাদের গুরুত্ব

জিহাদ ইসলামের একটি আমল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীনের বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষা করা এবং ইসলামের বিধিবিধান ও অনুশাসন মেনে চলা যেমন একজন মুমিনের দায়িত্ব, অনুরূপভাবে দীন রক্ষা করা, দীনকে সমুন্নত রাখা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জিহাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তেমনিভাবে তার কর্তব্য। মূলত শান্তির জন্য জিহাদ। বান্দাকে মানবীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত বানিয়ে দেওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য।

জিহাদের ফজিলত বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

অর্থ : "আল্লাহর পথে যে বান্দার দু'পায়ে ধূলি লাগে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।" (বুখারি)

> কাজ : 'জিহাদ অর্থ সন্ত্রাস নয়' শিক্ষার্থীরা এ পাঠের আলোকে শ্রেণিতে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

জিহাদ (اَلْجِهَادُ) সম্পর্কে পূর্বের পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এ পাঠে সন্ত্রাসবাদ (اَلْاِرْهَابُ) সম্পর্কে বর্ণনা করব।

সন্ত্রাসবাদ বলতে আমরা বুঝি পার্থিব কোনো স্বার্থ লাভের আশায় বিশৃঙ্খলা ও তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ও তাদের ক্ষতি করা।

ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে। বস্তুত উভয়ের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। বলা যায়, এ দুটো পরস্পর বিপরীত। রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদের লোভ, খুন-খারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য।

মানুষকে সত্যনিষ্ঠ ও নৈতিকগুণে গুণান্বিত করাও জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

অর্থ : “এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ।” (সূরা আল- আনফাল, আয়াত ৩৯)

পক্ষান্তরে, সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ভাবে রক্তপাত করে রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদ অর্জন করা এবং লুটতরাজ ও খুন-খারাবির মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ।

ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তপাত করতে শিখায়নি । বরং ইসলাম যে জিহাদের কথা বলে তাতে রক্তপাত নয়, মানবতার দিকনির্দেশনা দেয় । মুসলমানদের কোনো জিহাদেই নিরপরাধ সাধারণ লোকজনের কোনো ক্ষতি হয়নি । রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় একশত-এর কাছাকাছি জিহাদে (যুদ্ধে) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন । সবগুলো জিহাদ মিলিয়ে উভয়পক্ষে পাঁচশ এর কম লোকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ।

বর্তমান যুগে জিহাদের নামে যেভাবে বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, খুন-খারাবি ও নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই । বরং এটা সন্ত্রাসেরই নামান্তর । বস্তুত জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয় ।

উপরোক্ত আলোচনা ও বাস্তব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, জিহাদে সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই । জিহাদের সাথে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক নেই । সুতরাং আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ইতিহাস জেনে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করব এবং প্রকৃত মুসলমান হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করব ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য আলোচনা করবে ।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইবাদত বলতে কী বোঝায়?

২. হজের সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।

৩. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়? ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যাকাত কাকে বলে? যাকাতের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ কোনটি ?

ক. সালাত খ. যাকাত

গ. সাওম ঘ. হজ্জ ।

২. 'যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের অর্থশালীদের হাতেই পুঞ্জীভূত না হয় ।' অত্র আয়াত কোন বিষয়টি নির্দেশ করে?

ক. হজ্জ করা খ. দান করা

গ. যাকাত আদায় ঘ. সাহায্য করা ।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

বেলাল সাহেব বাংলাদেশ থেকে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হজ্জের সকল বিধি-বিধান সুষ্ঠুভাবে পালন করলেও অসুস্থতার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারেননি ।

৩. বেলাল সাহেব হজ্জের কোন বিধানটি পালনে অপারগ হয়েছেন ?

ক. মুস্তাহাব খ. সুন্নত

গ. ওয়াজিব ঘ. ফরজ ।

৪. এমতাবস্থায় বেলাল সাহেবের করণীয় কী ?

ক. পুনরায় হজ্জ করা খ. দম প্রদান করা

গ. সামর্থ্য থাকলে পুনরায় হজ্জ করা ঘ. আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব শফিকুর রহমান একজন রিকশা চালক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলেন। কেউ অসুস্থ হলে তার রিকশায় হাসপাতালে নিয়ে যান। একদা রিকশাচালক জনাব শফিকুর রহমান জনৈক যাত্রীর ব্যাগসহ রেখে যাওয়া পাঁচ লক্ষ টাকা স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা দেন। প্রধান শিক্ষক সাহেব টাকার মালিকের ব্যাগে সংরক্ষিত ঠিকানার মাধ্যমে টাকাসহ ব্যাগ মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দেন ।

ক. হজ্জের ওয়াজিব কয়টি?

খ. ইসলাম শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী? বুঝিয়ে লেখ ।

গ. প্রধান শিক্ষক সাহেবের কাজের মাধ্যমে কোন ধরনের ইবাদত পালন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. জনাব শফিকুর রহমানের কর্মকাণ্ডগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর ।

২। সাজ্জাদ ও সাকিব সাহেব দুই বন্ধু। সাজ্জাদ সাহেব একটি পোশাক শিল্পের মালিক। গত রমযানের ঈদে শ্রমিকদের বোনাস দিতে গড়িমসি করায় কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য পেতে একদিন কর্মবিরতি পালন করে। অপরদিকে সাকিব ছাত্র-জীবন থেকে পরোপকারী ছিলেন। বর্তমানে তিনি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে হাসপাতালে কর্মরত আছেন। তিনি হাসপাতালে নিয়মিত উপস্থিত থেকে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেন। একদিন তাঁর স্কুলজীবনের শিক্ষক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে এলে তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়ে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন।

ক. কে আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর?

খ. "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" – হাদিসটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. সাজ্জাদ সাহেবের আচরণে কার আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সাকিব তার শিক্ষকের যোগ্য উত্তরসূরি'– পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর।